গরুর নাম 'রেড চিটাগং' দাম তো পরে, পাওয়াই কঠিন

● এসএম আজাদ

কোরবানির হাটে বরাবরই দেশি লাল গরুর চাহিদা বেশি। রেড চিটাগং নামে পরিচিত এই গরুর জাত একেবারেই চট্টগ্রামের। স্থানীয়ভাবে এ-জাতীয় ষাঁড় 'লাল বিরিষ' নামেও পরিচিত। এই গরু দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি মাংসও সুস্বাদু। এর মোটাতাজাকরণে ক্ষতিকর নানা ওষুধের পরিবর্তে ব্যবহার হয় প্রাকৃতিক পদ্ধতি। যারা বাছ-বিচার করে দেশি গরু কেনেন, তাদের কাছে এ জাতের গরুর দাম বড় ব্যাপার নয়; বরং পাওয়াটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

জানা যায়, চট্টগ্রামের সাতকানিয়া, আনোয়ারা, চন্দনাইশ, রাউজান, পটিয়া ও বাঁশখালীতে রেড চিটাগং ক্যাটল (আরসিসি) বেশি দেখা যায়। তবে আশঙ্কার কথা হলো, দেশি এই গরুর সংখ্যা দিন দিন কমছে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএলআরআই) এক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশে বর্তমানে আড়াই কোটির ওপরে গরু রয়েছে। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে গরু পালন হয় মাত্র ২-৩ লাখ। বসতবাড়িতেই পালনের সংখ্যা বেশি। তবে এসব গরুর মধ্যে শতভাগ দেশি জাত, এমন গরুর সংখ্যা দ্রুত কমছে।

মূলত রেড চিটাগং গাভী থেকে বেশি দুধের আশায় কৃষক পর্যায়ে উচ্চমাত্রার সংকরীকরণের কারণে বিলুপ্তির মুখে পড়েছে এই প্রজাতির ষাঁড়ও। বর্তমানে রেড চিটাগংসদৃশ গরুর ৭০ শতাংশই সংকর বলে জানা গেছে।

প্রাণিবিজ্ঞানীরা জানান, মাঝারি গড়নের রেড চিটাগং গরু হয় চঞ্চল প্রকৃতির, দেখতে খুবই সুন্দর। এসব গরুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্য সব জাতের গরুর চেয়ে বেশি। মাংসও অন্য সব জাতের গরুর চেয়ে সুস্বাদু। চামড়ার মানও খুব ভালো। আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও লালন-পালনে সুবিধা, খাবারের খরচ কম। দেশি খড় বা প্রাকৃতিক নানা উৎস থেকে খাবার সংগ্রহ করে অনায়াসে এসব গরুকে বড় করা যায়। এসব গরু প্রতিকূল আবহাওয়ায় সহজে টিকে থাকতে সক্ষম। তাছাড়া দেশি গাভীর দুধ অনেক পুষ্টিসমৃদ্ধ ও বেশি মাত্রার ননিযুক্ত।

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে এসব গরুর দেহের দৈর্ঘ্য ১৩০ সে.মি. (প্রায়) এবং উচ্চতা ২৪ সে.মি. (প্রায়)। প্রাপ্তবয়স্ক ষাঁড়ের ওজন ২শ থেকে ৪শ কেজি এবং গাভীর ওজন দেড়শ থেকে আড়াইশ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের গায়ের রঙ (চামড়া, মাজল, খুর, শিং, চোখের পাপড়ি, ভালভা) লাল বর্ণের হয়ে থাকে। উৎপাদনে রেড চিটাগং ক্যাটল প্রজাতির দুগ্ধবতী গাভী দৈনিক দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ২.৯৮ কেজি (প্রায়) এবং দুধ উৎপাদনের মেয়াদকাল ২২৬ দিন (প্রায়)। এই প্রজাতির মোটাতাজাকরণের ক্ষেত্রে দৈহিক বৃদ্ধির হার দৈনিক ৩শ থেকে ৫শ গ্রাম।

কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রাকৃতিক পদ্ধতির পরিবর্তে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রজনন প্রক্রিয়ার (সংকরীকরণ) পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। মূল কারণ হলো বেশি পরিমাণে দুধ উৎপাদন। কেননা দেশি জাতের একটি গরু প্রতিদিন দুধ দেয় তিন-চার লিটার আর সংকর জাতের গরুর দুধ দেয়ার ক্ষমতা ১২-১৫ লিটার। আবার একই বয়সী দেশি জাতের বাছুরের চেয়ে সংকর জাতের বাছুরের দামও বেশি। এর সঙ্গে সরকারি ব্যবস্থাপনায় মাঠপর্যায়ে কৃত্রিম প্রজননের সুবিধা থাকায় দিন দিন সংকর জাতের গরু বাড়ছে। প্রজননকালে বেশি দুধ দেয়া গাভী বানাতে গিয়ে ষাঁড়ও সংকরীকরণ হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশু প্রজনন ও কৌল বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়া সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, রেড চিটাগং আমাদের গর্ব। খামারিরা যেভাবে লাভ হিসাব করছেন তা ঠিক নয়। বাস্তবে দেশি গরুর লাভই বেশি। উন্নতজাতের গরু পালনে পুষ্টি, খাদ্য ও পরিবেশ নিরাপত্তায় অধিকহারে বিনিয়োগ করতে হয়। রেড চিটাগংয়ে সেই খরচ কম। এরা প্রতি বছর একটি করে বাচ্চা দেয় এবং এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই বেশি। ফলে সহজে এরা রোগাক্রান্ত হয় না। পেটের আকার ছোট বলে এদের খাবারের প্রয়োজন হয় কম। এদের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য প্রাকৃতিক উৎসই যথেষ্ট। এগুলো দ্রুত বেড়ে ওঠে। লালন-পালনে আলাদা খরচ না হওয়ায় দুধ কম দেয়া বা আকারে মাঝারি হলেও এই গরু লাভজনক।

এদিকে হুমকির মুখে থাকা রেড চিটাগং গরু রক্ষায় উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ২০০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের (ইউএসডিএ) অর্থায়নে 'ক্যারেক্টারাইজেশন, কনজারভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দ্য রেড চিটাগং ইনডিজেনাস ক্যাটল ব্রিড' প্রকল্প নেয়া হয়েছে। জানা যায়, ইতিমধ্যে ময়মনসিংহের চর জেলখানাসহ দুটি গ্রামের কৃষকদের হাতে রেড চিটাগং গরু তুলে দেয়া হয়েছে। কয়েকটি বেসরকারি সংস্থাও খাঁটি রেড চিটাগং সংগ্রহ করে বংশবিস্তারের কাজ করছে। চট্টগ্রামের লাল গরু রক্ষায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২০০৬ সালে একটি প্রকল্প শুরু করে, যার মেয়াদ শেষ হয় ২০১১ সালে। ঢাকার সাভারসহ সাঙ্গু নদীর তীরবর্তী সাতকানিয়া, চন্দনাইশ, পটিয়া, আনোয়ারা ও রাউজানে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে চট্টগ্রামের সাতটি উপজেলায় কৃষকদের প্রশিক্ষণ, অর্থ সহায়তা ও জাত উন্নয়ন করা হয়।

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার ছদাহা ইউনিয়নের মিঠাদিঘি এলাকার নাছির উদ্দীন জানান, তার এলাকায় দুটি বড় ষাঁড় দিয়ে এলাকার গাভীগুলোর প্রজনন করা হয়। নাছির জানান, আগে তিনি চালের ব্যবসা করতেন। ব্যবসা বেশি ভালো যাচ্ছিল না। তাই চার বছর আগে ৫০ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে শুরু করেন লাল গরুর ব্যবসা। তার খামারে এখন গরুর সংখ্যা ১০টি। দুধ বিক্রি এবং প্রাকৃতিক প্রজননের মাধ্যমে তার মাসিক আয় প্রায় ১৮ হাজার টাকা। গোখাদ্য ও মজুরি বাদ দিলে মাসে তার মুনাফা ১২ হাজার টাকা। এতেই সুখী খামারি নাছির। তাই খামার নিয়ে রঙিন স্বপ্ন দেখছেন তিনি। ■